দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই

শিবপ্রসাদ রায়

দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই

শিবপ্রসাদ রায়

প্রাপ্তিস্থান

তুহিনা প্রকাশনী

কার্যালয়
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

বিক্রয়কেন্দ্র
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস অ্যান্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ঃ
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

দাম ঃ ৬.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশে বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই

ছোটবেলায় একটা বই পড়েছিলাম, নাম "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।" বড় হয়েও এদেশের বহু ঘটনার বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। মনে হচ্ছে গোটা দেশের ভাবনাচিন্তাগুলো যেন একটা অবাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। অবিলম্বে যদি আমরা বাস্তবের মাটিতে পা না রাখতে পারি, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে চরম সর্বনাশ। এদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং মনুষ্যত্বের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করা হয় ভারত বিভাগকে। এই ভারত বিভাগ ছিল এদেশের তাবৎ হিন্দু নেতৃবৃন্দের নির্বুদ্ধিতার পরিণতি। শতকরা সাতানব্বই জন মুসলমানের দাবি ছিল ঃ হিন্দু-মুসলমান দুটো পৃথক জাতি। হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে মুসলমানদের ধর্ম সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব। অতএব আমাদের একটা হোমল্যাণ্ড চাই, যার নাম পাকিস্তান। মুসলমান সমাজের পুরোটাই যখন ভারতবর্ষকে দু-খণ্ড করতে ব্যস্ত, তখন হিন্দু নেতারা কি করছিলেন ? জনগণকে বোঝাচ্ছিলেন, হিন্দু-মুসলমান পৃথক জাতি নয়। এক জাতি, ভারতীয় জাতি। মুসলীম লীগ এবং মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তানের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মহাত্মা গান্ধী বললেন ঃ ভারত দ্বিখণ্ডিত হলে তা আমার মৃতদেহের ওপর হবে। পণ্ডিত নেহেরু বললেন ঃ পাকিস্তান ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ননসেন্স। সর্দার প্যাটেল বললেন ঃ ভারত বিভাগ এ তো একটা পরিহাস মাত্র। এমন কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর বিরাট গ্রন্থ "ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড" লিখে প্রমাণ করলেন, পাকিস্তান একটা অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপার। বেশীর ভাগ মুসলমান জাতীয়তাবাদী, আর তারা সবাই কংগ্রেসের মধ্যে। সুতরাং অদূরদর্শী এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই পাকিস্তানের কথা বলে আতঙ্ক ছড়াতে চাইছেন। এইসব নেতাদের লক্ষ লক্ষ অনুগামী কোটি কোটি মানুষকে এই মিথ্যে কথাটা বোঝালো। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটেছিল ? অসংখ্য প্রাণ, চোখের জল, নারীর সম্ভ্রম আর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান রচিত হল। হিন্দু এবং মুসলমান দুটি পৃথক জাতি এই সত্যকে স্বীকার করে ভারতকে দুভাগ করা হল। দেড় কোটি হিন্দুর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাড়ানো হল পাকিস্তান থেকে। এখনও নিয়মিত তাড়ানো হচ্ছে এবং তাড়ানো হবে।

এখন এদেশের জাতীয় নেতাদের এবং তাদের অনুগামীদের কী বলা হবে? ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, আত্ম-প্রবঞ্চক, অদূরদর্শী, ক্ষমতা লোভী? প্রত্যেকটি বিশেষণ এঁদের কীর্তির উপযুক্ত। কিন্তু আমি তা বলব না। এঁরা লোকান্তরিত তাই এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই বলব, এঁরা ছিলেন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন। এঁদের কোন আচরণই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু তার জীবন উৎসর্গ করেছে স্বর্গীয় প্রেরণায়। মুসলমান তার স্ট্রাটেজী তৈরী করেছে ভারতে মুসলীম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কামনায়। পূর্ববাংলা পাকিস্তান হল মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলে। ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণদানের সংখ্যা পূর্ববঙ্গেই সর্বাধিক। কিন্তু আত্মদানের তালিকায় পূর্ববঙ্গে কেন গোটা বঙ্গেও একজন মুসলমান নেই। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজের সহযোগিতা করে মুসলমানরা পুরস্কার লাভ করল পাকিস্তান, বাংলাদেশ। আর ফাঁসীতে গুলিতে প্রাণ দিয়ে পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুরা হল বাস্তুচ্যুত, শরণার্থী রিফিউজী। মাতৃভূমি থেকে তাদের পালিয়ে আসতে হল ভারতে। যারা আসামে আশ্রয় নিল তাদের পরিচয় হলো বিদেশী বহিরাগত। যারা বাংলাদেশে রয়ে গেল তারা হয়ে গেল জিম্মি মালাউন কাফের। আর যারা ত্রিপুরায় গেল তারা সংবাদপত্রের ভাষায় হল অনুপজাতি।

কি করুণ পরিণতি! অথচ শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া একজনও আত্মসম্মান-সম্পন্ন নেতা ছিলেন না গোটা দেশে, এই ঘটনা যাঁকে বিচলিত করেছে। তাঁর প্রচেষ্টায় রক্ষিত হয়েছিল এই পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব। তাঁকে সবাই বলেছিল সাম্প্রদায়িক। শ্যামাপ্রাসাদ কাশ্মীরের চূড়ান্ত ভারতভুক্তি চেয়েছিলেন। ৩৭০ ধারার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। তাই তাঁকে হত্যা করা হল। যারা কাশ্মীরের অর্দ্ধাংশ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়ে বাকীটাকে প্রায় পাকিস্তান করে রেখে দিল, যাদের জন্য কাশ্মীর আজ অগ্নিগর্ভ তারা হল প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক। ৩৭০ ধারার উচ্ছেদ করে কাশ্মীর সমস্যার সত্যিকারের সমাধান চায় তাদের সাম্প্রদায়িক বলার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন নেতারা আজও দেশের নেতৃত্বে। ভারতের এক-তৃতীয়াংশ, কাশ্মীরের অর্ধেক উপঢৌকন দেওয়া সত্ত্বেও ভারতে আবার সেই একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কাশ্মীর সবটাই চলে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর আজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কাশ্মীর চালাচ্ছে পাকিস্তান এবং তাদের বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংস্থা।

ভারত আবার খণ্ডিত হ'তে পারে। বিদেশী অর্থে পুষ্ট হ'য়ে অধিকাংশ মুসলমান সেই উদ্দেশ্য কাজ ক'রে চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলির নির্বিচার তোষণে তারা ক্রমশঃই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বে-আইনীভাবে সরকারী জমি দখল করে পার্কসার্কাসে অসংখ্য বাড়ী করেছে। রাজাবাজারে গড়ে তুলেছে মসজিদ।' ৮৬-তে প্রজাতন্ত্র বয়কট করেছে। দিল্লীর ইমাম বলেছে, আমরা এদেশের আইন-কানুন মানি না। বাবরী মসজিদ না পেলে আবার হোমল্যাণ্ডের আওয়াজ তুলব। পার্লামেন্টে আগুন লাগিয়ে দেব। উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে দাঙ্গা বাধাচ্ছে মীরাটে, আলিগড়ে, দিল্লীতে, বরোদায়। এই অবস্থাটা বুঝে যারা কিছু বলতে যাচ্ছে তাদেরই বলা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। এই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নেতাদের অর্ধেক ভারতবর্ষ হারিয়েও কাণ্ডজ্ঞান ফেরেনি। হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হ'ল। কিন্তু এ দেশের নেতাদের একজাতিতত্ত্বের মিথ্যে নেশাটা কাটাল না। পাকিস্তান হিন্দু-শূন্য, বাংলাদেশ প্রায় হিন্দু-শূন্য, কিন্তু লোক বিনিময়ের মতো একটা বাস্তব সমাধান হাতের কাছে পেয়েও তা ব্যবহার করা হ'ল না। তাই যে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে থাকলে ধর্ম বিপন্ন হবে বলে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল, তারা ভারতেই রয়ে গেল। তাদের কিছু হারাতে হ'ল না। পাকিস্তান, বাংলাদেশ রইল তাদের ফিক্সড্ ডিপোজিট। ওগুলো মুসলীম রাষ্ট্র। ওখানে কারো হাত দেওয়া চলবে না। ভারত হ'ল যৌথ সম্পত্তি। এখান থেকে যতটা পারো লুটে নাও। ভারতকে দু'-টুকরো করার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান হ'ল মুসলীম রাষ্ট্র। ভারত কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্র হ'ল না। হিন্দু রাষ্ট্রে অন্য কোন ধর্ম বিপন্ন হয় না।

নেপাল হিন্দুরাষ্ট্র, সেখান থেকে একটি মুসলমানকে পালাতে হয়নি। কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশের হিন্দুরা বলির পাঁঠার মতোই অসহায়। যখন খুশী তাদের ওপর অত্যাচার করা যায়। বিতাড়িত করা যায়। যে কোন হিন্দু নারীকে ইচ্ছা করলেই অপহরণ করা যায়, বিবাহ করা যায়। ভারতের একজন মুসলমানেরও কিন্তু এ জন্য কষ্ট হয় না। কোনদিন একটা মৌখিক প্রতিবাদও করে না। এই সেদিন পঞ্চাশ হাজার চাকমা হিন্দুকে চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হ'ল। বাংলাদেশ তাদের ফিরিয়ে নিতে চাইছে। তারা ভয়ে ফিরতে চাইছে না। কারণ ইসলামিক রাষ্ট্র মানে কি তারা জানে।

ভারতে সেই শতকরা সাতানব্বই জন পাকপন্থীই রয়ে গেছে। ধর্মসংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেই। এরা মুজিব মারা গেলে খুশী হয়। ভুট্টোর ফাঁসী হ'লে বাস পোড়ায়, সিনেমা

হ'ল পোড়ায়। ক্রিকেট, হকিতে পাকিস্তান জিতলে রেডিওতে মালা দেয়। রাজাবাজারে, পার্কসার্কাসে ব্যাণ্ড বাজিয়ে মিছিল বার করে। ফুটবলে মহামেডান স্পোর্টিং জিতলে আল্লা হো আকবর ধ্বনি দেয়। এইসব আচরণের একটাই অর্থ, এদের অধিকাংশেরই আনুগত্য দেশের বাইরে। লখনউয়ের মুসলমানেরা ইরাক কিংবা ইরানের সমর্থক। বাড়ীতে বাড়ীতে খোমেইনি আর সাদ্দাম হোসেনের ছবি। ওখানে প্রায়ই যে শিয়া সুন্নীর প্রাণঘাতী সংঘর্ষ হয় তা আসলে ইরাকপন্থী এবং ইরানপন্থী মুসলমানের সংঘর্ষ। এখন যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন তোলেন, ভারতবর্ষে ভারতপন্থী মুসলমান কই? সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ সেই ব্যক্তিকে বলেন সাম্প্রদায়িক। কেন বলেন? এরা দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে। এদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল তিনটি মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এই তিনটি আদর্শই নির্ভরশীল গরিষ্ঠ হিন্দু জনসংখ্যার ওপর। ভারতীয় উপমহাদেশের যেখানে হিন্দুর সংখ্যা কম হ'য়ে গেছে সেখানেই এগুলো অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এসব কথা বলার লোক আর নেই। আফগানিস্তানের নাম একদিন গান্ধার ছিল, দেশটা হিন্দুদের ছিল, ভারতের অংশ ছিল এই কথাটাই অনেকের মনে নেই। কাশ্মীরে একটাকা কেজি চাল খাইয়ে দুটাকা কেজি চিনি খাইয়ে এবং এম.এ. ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত বিনা পয়সায় পড়িয়েও সেখানে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র, গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র সবই অচল। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপাতি চেষ্টা করলেও এক ইঞ্চি জমি কিনতে পারবেন না। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় পশ্চিম পাঞ্জাবের হাজার বিশেক হিন্দু মুসলমানদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালিয়ে এসেছিল কাশ্মীরে। তাদের সংখ্যা এখন পঁচাত্তর হাজার। তাদের আজ পর্যন্ত নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। তারা কাশ্মীরে অবাঞ্ছিত।

শেখ আব্দুল্লার আমলে কাশ্মীরে একটা বিল এলো, যাতে পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অথচ পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সম্পত্তি মানে শত্রুর সম্পত্তি। প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে 'এসমা' প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু কাশ্মীরে পারেন নি। এ ব্যাপারে সব রাজনৈতিক নেতারাও নির্বাক। দেশদ্রোহিতার অপরাধে যাকে সতের বছর জেলে রাখতে হয়েছিল, এবং যার হাতে শ্যামাপ্রসাদের

খুনের রক্ত লেগে আছে সেই শেখ আবদুল্লাকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হয়। আবদুল্লা মারা গেলে ফারুককে। শুধু সেখানে হিন্দু সংখ্যালঘু বলে। গত কয়েক বছরে কাশ্মীরে তিনশো হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। তিনলক্ষ হিন্দুকে বিতাড়িত করা হয়েছে। সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়েছে। দেশের অধিকাংশ নেতা এই ঘটনা জানেন কিন্তু তাঁরা সকলেই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, তাই প্রতিবাদ করার মতো কাণ্ডজ্ঞান তাঁদের হয়নি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি সমীক্ষায় হিসাব কষে দেখিয়েছে মুসলমানদের অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার এবং বিপুল অনুপ্রবেশ দু'হাজার সালের মধ্যেই ভারতে বহু এলাকায় হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে দেবে। ব্যাপক ভাবে হিন্দুদের গণধর্মান্তর করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা আসছে। একথা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। হাজার হাজার বছরের মীনাক্ষীপুরমে মাত্র সাড়ে আটশো হিন্দু সংখ্যালঘু হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা হয়ে গেল রহমতনগর। ভারতে হিন্দু মুসলমান হ'য়ে গেলে ভারত আর ভারত থাকবে? এই ছোট্ট কাণ্ডজ্ঞানের কথাটা দেশের দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ধর্মীয় গুরু, রাজনৈতিক নেতা, সাধু-সন্ত, বুদ্ধিজীবী কারো মাথায় ঢুকছে না। বরং তারা এ বিষয়ে আরো গোলমাল পাকিয়ে দিচ্ছে নানাভাবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সম্মেলন হ'য়েছিল বেলুড়ে ১৯৮১ সালে। তিনদিন ধরে আলোচনা হল কি করে সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় করা যায়। এই দায়িত্বটা যেন শুধু হিন্দুদেরই। শিলঙে খ্রীষ্টানদের হাতে মিশনের সন্ন্যাসী মার খেলেন সে কথা কেউ বললেন না। অন্য ধর্মের হাতে মার খাওয়া আর সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করা এটা এদেশের অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কাজ।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বর্ধমান শহর থেকে টেরেসাকে একলক্ষ টাকা তুলে দিলেন। শুধু উপাচার্য নন, মন্ত্রীরা এবং বহু বিশিষ্ট হিন্দু লক্ষ লক্ষ টাকা মহিলাকে সংগ্রহ করে দিলেন। মা করুণাময়ী জগজ্জননী বলে কি নাচানাচিই না হচ্ছে। এই টাকা দিয়ে ইনি এদেশের হাজার হাজার হিন্দুকে খ্রীষ্টান তৈরি করবেন। এই কাজে সাফল্য দেখানোর জন্যই খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলো তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিল। উত্তর পূর্বাঞ্চলে আজ যাবতীয় সমস্যার উৎস এই ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানরা। ত্রিপুরায় কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যা করল ওরাই। এখনও করে চলেছে। নিহত হিন্দুদের

জন্য জগজ্জনীর চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল পড়েনি। কলেজ স্ট্রীটের এক ছোট ব্যবসায়ী বিবাহের জন্য একটি অনাথিনী মেয়ে চেয়েছিল জননীর কাছে। জবাব এলো খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে তবেই মেয়ে পাওয়া যেতে পারে। এই হচ্ছে মাদারের আসল পরিচয়। খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। খ্রীষ্টান না হলে তিনি কারো স্থায়ী সেবা করেন না। বাংলাদেশ টেরেসাকে প্রবেশের অনুমতিই দিল না। আর এই হিন্দু সমাজ! গরু যেমন গরুর মাংস গাড়ীতে করে নির্বিকার চিত্তে বয়ে নিয়ে যায়, কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, পরমানন্দে জাবর কাটে, এরাও তেমনি। চৈতন্যহীন একটা জাত। ভালমন্দ বিবেচনা করার শত্রু-মিত্র চেনার ক্ষমতাও আর তাদের নেই। হিন্দুত্বের সম্পূর্ণতা, শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

পৃথিবীতে কেউ সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে না। শুধু হিন্দুরা বলে। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেও যে আগে হিন্দু ভূমির দরকার, হিন্দু জনসংখ্যার দরকার এই কাণ্ডজ্ঞানটুকুও এদের নেই। বাস্তবতাবর্জিত দিব্যভাব, তুরীয়ভাব, দাঁড়িয়ে গেছে ভণ্ডামি মিথ্যাচারে আর আত্মপ্রবঞ্চনায়। এই দীর্ঘস্থায়ী ভাবের ঘরে লুকোচুরি গোটা হিন্দু জাতটাকে মেরুদণ্ডহীন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করে দিয়েছে। তাই অতীতে, বর্তমানে শুধু দেখি হিন্দু মার খায়, কাঁদে পালায়—ধর্মান্তরিত হয়। একটি জাতের যদি আত্মরক্ষার শক্তিই না থাকে, তার উচ্চ দর্শন, সহস্র মহাপুরুষ থেকেই বা কি লাভ? এই রকম দুর্বল জাতকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, করুণা করে, এখন হিন্দুদের কেউ করুণাও করে না। শিকার বলে মনে করে। সব শিকারীর লক্ষ্য এখন হিন্দু সমাজ। সেবা আর প্রলোভনের টোপ হাতে নিয়ে হাজার হাজার শিকারী হিন্দুদের শিকার করতে এসেছে। আসছে।

খ্রীষ্টানরাষ্ট্র মুসলীম রাষ্ট্রগুলি থেকে টাকা, কর্মী ভারতে আসে কোন্ সাহসে? কারণ তারা জেনে গেছে এখানে কোন ঝুঁকি নেই। হিন্দু বাগাড়ম্বর বিলাসী শিথিল, ক্রয়যোগ্য, উদাসীন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, নিজেকে মনে করে উদার সর্বজ্ঞ। এমন আত্মনাশী জাত বিশ্বের আর কোথায় পাওয়া যাবে? অতএব শিকার কর। আরব রাষ্ট্রের টাকা আসছে ভারতে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা শুধু ঘুরে বেড়ায় হিন্দু-পাড়ায়। তাই এখন এদেশের ধর্মীয় গুরু রাজনৈতিক নেতা এবং জনগণকে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। যোগী, সাধক, ভক্ত, বৈষ্ণব সকলকে মনে রাখতে হবে, জপ করুন, সাধনা করুন, কীর্তন করে কেঁদে ভাসিয়ে দিন, আপত্তি নেই, সর্বাগ্রে মনে

রাখুন হিন্দু ভূমি, হিন্দু সমাজ, হিন্দু জাতি না থাকলে, কিংবা হিন্দুর সংখ্যা কম হ'য়ে গেলে এ সব কিছু থাকবে না। রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীদের মনে রাখতে হবে, মার্ক্সবাদ গান্ধীবাদ যাই বলুন এ সব তত দিনই বলা যাচ্ছে, যত দিন এদেশে হিন্দু বেশী আছে। মার্ক্সবাদে সুপণ্ডিত কিংবা গান্ধীবাদের তাত্ত্বিক নেতাদের মনে রাখতে হবে, তাঁদের সব তত্ত্বজ্ঞান মূল্যহীন হ'য়ে গেল, পূর্ববঙ্গে হিন্দু সংখ্যালঘু হ'য়ে গেল বলে। প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্ত এখানে যত গর্জনই করুন তিনি ভাবতেই পারেননি তাঁর স্বপ্নের মার্ক্সবাদ জন্মভূমি ফরিদপুরে গিয়ে প্রচার করবেন। প্রফুল্ল সেন ভুলেও ভাবেন নি তাঁর জীবনাদর্শ গান্ধীবাদ পিতৃভূমি খুলনায় গিয়ে প্রচারের আর সুযোগ হবে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর শিষ্যদের দাবী, তিনি পুরুষোত্তম, পূর্ণব্রহ্ম। তিনি বহু শিষ্যকে বলেছেন ধর্ম সবই সমান। কিন্তু পাকিস্তান হবার আগেই তিনি সৎসঙ্গের মূল আশ্রম পাবনা ছেড়ে পালিয়ে এলেন দেওঘরে। তাঁর দিব্যজ্ঞান তাঁকে দিয়ে অনেক উদার মহৎ কথা বলিয়েছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান বলেছেঃ যা পালা হিন্দুস্থানে। যেখানে হিন্দু বেশী আছে। তোর ব্রহ্মের শক্তি দিয়ে তুই এখানে আত্মরক্ষা করতে পারবি না। তাই কাল বিলম্ব না করে তিনি পালিয়ে এলেন। হিন্দুর সংখ্যা কম হয়ে গেলে পূর্ণব্রহ্মেরও মর্যাদা থাকে না। এই সরল সত্যটা ঠাকুরের শিষ্যদের সর্বাগ্রে বুঝতে হবে।

এই বঙ্গে আর একজন খ্যাতিমান গুরু ছিলেন। ইনি জন্মসিদ্ধ ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী। জন্ম ঢাকা জেলার মেদিনীমণ্ডল গ্রামে। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হয়ে গেলে তাঁর সিদ্ধাই কোনও কর্মে লাগল না। তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ল কোথায়? যেখানে হিন্দু বেশী আছে। হিন্দু কম হলে পূর্ণব্রহ্মও ক্ষমতাহীন, জন্মসিদ্ধ ব্রহ্মচারীও তাই। এগুলো দিব্যজ্ঞানের কথা নয়। রাগের কথাও নয়। প্রমাণিত সত্য। কিন্তু এই আঘাত, পলায়ন থেকে এঁরা কিছুই শিক্ষা নিলেন না। সন্তানদল একটি গানের রেকর্ড বার করেছে যার প্রথমে আজান এবং পরে কথা, যে আল্লা সেই রাম, রামনারায়ণ রাম। আল্লা এবং রামের সহাবস্থান পূর্ববঙ্গে হল না। আল্লার অনুগামীদের দাপটে হিন্দুদের চোদ্দ-পুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে আসতে হল। তার পরেও এই গান নিশ্চয়ই ঔদার্য এবং সহিষ্ণুতার লক্ষণ। কিন্তু এটি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার, আত্মহত্যার লক্ষণও বটে। এত উদার কিংবা ভণ্ড জাত কখনও বাস্তবের সম্মুখীন হতে পারে না। তাই যখনই হিন্দু সমাজের ওপর আঘাত এসেছে এই সব দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মার্ক্সবাদী, পূর্ণব্রহ্ম ঠাকুর,

জন্মসিদ্ধ ব্রহ্মচারীরা দিশেহারা হয়ে গেছেন। পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তাঁদের ঔদার্য, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, ব্রহ্মত্ব, সিদ্ধাই কোনও কাজে লাগেনি।

ভারতে এসে এঁদের প্রথম কাজ ছিল ধর্মের একটা ভিত্তি তৈরি করা। হিন্দু সমাজের সকল সম্প্রদায়কে একটা কমন প্লাটফর্মে আন। হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। প্রাণের আধার যেমন শরীর তেমনি হিন্দু ধর্মের আধার হচ্ছে হিন্দু জাতি, হিন্দু সমাজ। সংগঠিত হিন্দু সমাজ না থাকলে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী হাজার হাজার ধর্মগুরু, পণ্ডিত, রাজনৈতিক নেতা কেউ নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন না। পালাতে হয়, মরতে হয়, ধর্মান্তরিত হতে হয়। এই খণ্ডিত বঙ্গে এখন মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা পঁয়ত্রিশ। এই সংখ্যা একান্নতে পৌঁছলেই গান্ধীবাদ, মার্ক্সবাদ, ভজন, কীর্তন, মালা, টিকি, মহোৎসব, ভোগারতি সব শেষ হয়ে যাবে। 'সব ধর্ম সমান', 'খেটে খাওয়া মানুষের কোন জাত নেই', 'হিন্দু মুসলিম ঐক্য চাই', ' এ দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ', 'এখানে শুধু হিন্দুর কথা বলছেন কেন'—এ সব বলার জন্য তখন কেউ থাকবে না। পূর্ববঙ্গে এইসব দিব্যজ্ঞানযুক্ত কথা আর কেউ বলে না। বলতে পারে না। ঢাকায় রমনার বিখ্যাত কালীবাড়ীটা যখন কামান দেগে চূর্ণ করে ট্যাঙ্ক দিয়ে সমান করা হল তখন কেউ একটা কথা বলেনি। এগুলো ফলিত সত্য। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে হাজার হাজার হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা হ'লো। সবাই কিন্তু নির্বাক। এই বাস্তব সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আজ সকলকে ধর্মের কথা, রাজনীতির কথা, ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে।

হিন্দু সংগঠিত, শক্তিশালী এবং সংখ্যাগুরু না থাকলে শুধু তার ধর্মই লাঞ্ছিত হয় না, তার জীবন সম্পত্তিও নিরাপদ থাকে না। এ শুধু পূর্ববঙ্গ কিংবা পাকিস্তানের ইতিহাস নয়। এক হাজার বছরের ইতিহাস। গত হাজার বছর ধরে হিন্দুর দেবদেবী যেভাবে লাঞ্ছিত অপবিত্র হয়েছে তাতে দেবতাদের মর্যাদা বাড়েনি। বহু মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আমাদের দেবদেবীর মহিমা কি শুধু পুঁথিপত্রে, কথাবার্তায়? কথাটা মিথ্যে নয়। এদেশে একশ বছর আগে জনসংখ্যা ছিল ত্রিশ কোটি, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। অর্থাৎ একটা দেবতা একজন মানুষের কল্যাণ করলেও আমরা তিন কোটি দেবতাকে বিদেশে কল্যাণের জন্য রপ্তানি করতে পারতাম। তাহলে এদেশে

এত রোগ, শোক, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ভণ্ডামী, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা কেন? এ দেশে মঠ মন্দিরের সংখ্যা চৌত্রিশ লক্ষ, সাধু সন্ন্যাসী, মোহান্ত, পণ্ডিত, পূজারীর সংখ্যা আটান্ন লক্ষ। এঁদের দায়িত্ব হিন্দু সমাজকে অভয় দেওয়া, সাহস যোগানো।

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এঁরাই ভীত সন্ত্রস্ত সংকুচিত মাত্র কয়েক হাজার দেশী বিদেশী মৌলভী আর পাদ্রীদের সামনে। কেন? কোথাও নিশ্চয় ফাঁকি আছে। আসলে জাত হিসাবে আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর, ফাঁকিটা সেখানেই। সাধু-সন্ন্যাসী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, পুরোহিত যাই হোন না কেন বেশীর ভাগ হিন্দুর জীবন আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তি এবং পরিবারকে কেন্দ্র করেই তার সব চিন্তা ও কর্ম সীমাবদ্ধ। জীবনীশক্তির সবটুকু এতেই ব্যয়িত। মানুষের ওপর তার বিশ্বাস নেই, সোজাসুজি ঈশ্বর, গুরু, জ্যোতিষীর ওপর নির্ভরশীল। হিন্দুর জীবনচর্যায় রাষ্ট্র নেই, সমাজ নেই, দেশ নেই। এটাই বৃহৎ ফাঁকি, এই ফাঁকিই সমগ্র হিন্দু সমাজকে স্ববিরোধী, আত্মবিশ্বাসশূন্য ক'রে দিয়েছে। হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজকে তারা সংকীর্ণ কাজ মনে করে। অথচ তাদের দিন কাটে জীবন কাটে ইউনিয়ন রাজনীতিতে গ্রুপিং ক'রে, ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, জাতপাত, দলাদলি, ভেদ-বুদ্ধি, ঈর্ষা আর পরচর্চার পূর্ণ উত্তেজনায়।

পাড়ায় বন্ধু নেই, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মামলা চলছে, নিজের বাবাকে খেতে দেয় না, সাঁইবাবার ভজনা করছে। গর্ভধারিণী মা ভিক্ষে করছে আর ছেলে তারাপীঠ ঠন্ঠনিয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে মা মা চীৎকার করে। এরাই রাজনীতিতে হিন্দু মুসলীম ঐক্যের আওয়াজ তুলছে। দুনিয়ার শ্রমিককে এক করার কথা বলছে। হীন প্রবৃত্তিপরায়ণ, স্বার্থপর হিন্দু, ভগবানকে পর্যন্ত নির্বোধ ভাবতে শুরু করেছে। তাই সকলকে বঞ্চিত ক'রে জপে, কীর্তনে পুজোয় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাইছে। স্ববিরোধী মানুষের দিব্যজ্ঞান থাকে, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ভণ্ডামী ক'রে তাদের বেঁচে থাকতে হয়। স্ববিরোধী জাতের পায়ের তলায় মাটি থাকে না। আমাদের ধর্ম রাজনীতি সব কিছু একটা অবাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। তাই হিন্দুদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ অংশটাই দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার ইতিহাস।

গৌরাঙ্গদেব বলে গেলেন ঃ 'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর' এ যুগের মহামন্ত্র। আমরা পাগলের মত নাম-গানে মেতে গেলাম। তিনি বললেন ঃ 'সঙ্ঘ শক্তি কলৌযুগে'।

কলিযুগে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ছাড়া বাঁচা যাবে না। সে কথাটা ভুলেই গেলাম। আমাদের একটা দেবতা নেই যার হাতে অস্ত্র নেই। অথচ যে কোন হিন্দু বাড়ীতে দেখা যাবে একদঙ্গল ঠাকুর দেবতা আছেন, একগাছা লাঠি নেই। বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কাছে দারিদ্ররা সারা বছর উপেক্ষিত। শুধু বন্যায় দুর্যোগে দরিদ্ররা নারায়ণ হয়। ভাল কথা। কিন্তু বিবেকানন্দ যে বলে গেলেন ঃ 'সমাজকে সংগঠিত করা দরকার। আগামী পঞ্চাশ বছর তোদের আরাধ্যা দেবী হোক ভারতজননী' অর্থাৎ রাষ্ট্র সাধনা। সে কথা সযত্নে বাদ দিলাম, মূল গাছটায় জল না দিয়ে আমরা শুধু ডালপালার সেবাযত্ন করে চলেছি। ফলে গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। জাত বাঁচলে, রাষ্ট্র বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচব। সকল চিন্তাশীল মানুষের ভাবনাচিন্তাগুলো এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ক'রতে হবে।

ভারতবর্ষে তাই এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, ইতিহাসসম্মত বুদ্ধিগ্রাহ্য কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত কাজ হচ্ছে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত ক'রে হিন্দুদের একটা বিশাল শক্তিতে পরিণত করা। রাজনীতি যাদের ব্যবসা তাদের জন্যও এটা দরকার। হিন্দু সমাজ না থাকলে তাদের ব্যবসা অচল হ'য়ে যাবে। কোন অসাম্প্রদায়িক দলও মুসলমান এলাকায় হিন্দু প্রার্থী দাঁড় করাতে সাহস পায় না। মুসলমানদের মধ্যে যারা দেশপ্রেমিক উদারপন্থী আছেন, তাদের জন্যও এটা দরকার। এম. সি. চাগলার মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মুসলমান সমাজে কোন স্থান ছিল না। ইরানে কিংবা পাকিস্তানে থাকলে তাঁকে কোতল করা হ'ত। হিন্দু সমাজ তাঁকে সম্মান দিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। সঙ্গীত সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে হিন্দুরা শ্রদ্ধায় ভালবাসায় আপন ক'রে নিল। অথচ 'সুর আমার কাছে প্রার্থনা, সঙ্গীত আমার কাছে ঈশ্বর', বলায় পাকিস্তানে দাবী উঠল নূরজাহানকে নতুন করে মুসলমান হ'তে হবে।

দাঊদ হায়দার নামে একজন বাংলাদেশী কবি মহম্মদের সমালোচনা করায় তার প্রাণদণ্ডের দাবী উঠেছিল। তাকে পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা করতে হয় ভারতে। ভারত মুসলিম রাষ্ট্র হ'লে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে যে কোন সময় মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারে। যেমন বিহারে আবদুল গফুর, মহারাষ্ট্রে আন্তুলে, রাজস্থানে বরকতউল্লা, আসামে আনোয়ারা তৈমুর। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে একজন হিন্দু

মুখ্যমন্ত্রী হবে কেউ ভারতে পারেন? পারেন না। অতএব যা কিছু কল্যাণময় এবং শুভ, তার রক্ষার জন্যই যে কোন মূল্যে হিন্দু সমাজকে জীবিত রাখতে হবে। যারা হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে চাইছে তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন, সহযোগিতা করুন। 'আর্য্যসমাজ', 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ', 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ', 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' সর্বশক্তি দিয়ে হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে এদের গতি বৃদ্ধি করুন। নিজে কপট উদার সেজে এদের সাম্প্রদায়িক বলে আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করবেন না। একটু কাণ্ডজ্ঞান দেখান। আমাদের দিব্যজ্ঞানের ফলে অর্ধেক ভারত আজ পাকিস্তান। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে পঁয়তাল্লিশ কোটি মুসলমান, দু কোটি খ্রীষ্টান। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ খুব অল্প সময়ে আট লক্ষেরও বেশী মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে এনেছে। আরো আনবে। ইস্কনও যথেষ্ট কাজ করেছে। ইস্কনের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। যে কাজ আমাদের করা উচিত ছিল সেটা ওরা করে দিচ্ছে। নিজের নীচতা দিয়ে ওদের বিচার করবেন না।

দেশদ্রোহিতার অপরাধে মাইকেল স্কট, ফাদার ফেরারকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। সম্প্রতি ফাদার ডি. সুজাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। বিদেশী এজেন্ট খ্রীষ্টান ফাদাররাই। ইস্কন ভারতে বিদেশী এজেন্ট হলে সারা পৃথিবী জুড়ে মন্দির করত না। এত কৃচ্ছ্র সাধন করত না। অন্য দিকে বিহার-শরীফে মোরাদাবাদে মর্টার, বন্দুক তৈরির কারখানা পাওয়া গেল মুসলমানপাড়ায়। লক্ষ্ণৌয়ের মসজিদে পাওয়া গেল পনেরো হাজার তাজা বোমা, ধানবাদের মুসলিম হোটেল থেকে পাওয়া গেল বাক্স বাক্স জোরালো ডিনামাইট। টন টন আর ডিএক্স রয়েছে মুসলীম মাফিয়াদের হাতে। ধর্ম প্রচারের নামে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের খোলাখুলি রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ অচলায়তন হিন্দু সমাজের টনক নড়িয়ে দিয়েছে। তার লক্ষণ ফুটে উঠেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। বিপুল শক্তি নিয়ে হিন্দু সমাজের জাগরণ ঘটছে।

হিন্দুর শক্তি বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রদ্রোহী ছাড়া কারো আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। হিন্দু কারো মসজিদ ভেঙেছে, গীর্জা ভেঙেছে—ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত নেই। কিন্তু আজও একটি হিন্দু নারী মুসলমান দ্বারা অপহৃত হ'লে, হিন্দু মন্দির মুসলমান কর্তৃক ধ্বংস হলে কোন মুসলমান তার প্রতিবাদ করে না। নীরবে সমর্থন করে। এগুলো বিদ্বেষ

সৃষ্টি নয়, বাস্তব অবস্থার কথা। হিন্দুর বাঁচার কথা। সভ্যদেশে আইন সকলের জন্য সমান হয়। এখানে মুসলমানদের জন্য বিবাহ আইন পৃথক। হিন্দু বিয়ে করবে একটি, পরিবার পরিকল্পনা করে সন্তান রাখবে দুটি। তাদের শ্লোগান, আমরা দুই, আমাদের দুই। আর একজন মুসলীম বিয়ে করবে চারটি, পরিবার পরিকল্পনা করবে না। তাদের শ্লোগান, আমরা পাঁচ, আমাদের পঁচিশ। এই ব্যবস্থা পাশাপাশি চললে ভারত মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'তে কত দিন? শুধু কি এখানেই শেষ? শিবঠাকুরের আপন দেশে আইনকানুন সর্বনেশের মতোই ভারতের ব্যাপার স্যাপার।

যে মুসলমানের কাছে বিবাহের কোন পবিত্রতা নেই স্থায়িত্ব নেই, আজ বিয়ে ক'রে কাল তালাক দিয়ে পরশু নিকাহ্ করতে পারে। তিনি বিবাহ করতে পারবেন চারটি। আর যে হিন্দু বিশেষ কারণ না ঘটলে কিছুতেই দুটো বিয়ে করবে না, নিয়ন্ত্রণ আনা হলো তার জন্য। এই সেকুলারিজমের আরও মহিমা আছে। হিন্দু দুটি বিয়ের চেষ্টা করলে তাকে গ্রেফতার করতে পারবে তিনটে স্ত্রীর মালিক মুসলমান বিচারপতি। সাজাটি কি? সাতবছর সশ্রম কারাদণ্ড। জানি বিশ্বাস হচ্ছে না। বিশ্বাস না হওয়ার কারণ—নেতা, সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণে জনগণকেও ক্রমশঃ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এদেশের সব দলের নেতারাই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নয়তো আরবের অর্থপুষ্ট।

এখন তো প্রমাণিত বি জে পি ছাড়া সব দল দাউদ, মেমন, 'রশিদের এজেন্ট। তাই প্ল্যান করে তারা দেশটাকে মুসলমানদের করে দিতে চাইছে। যারা এই সত্য কথাগুলো জনসমক্ষে বলছে, আরবীয় এজেন্টরা তাদের সাম্প্রদায়িক বলে নিজেদের মুখ রক্ষা করতে চাইছে। এই দ্বিমুখী চক্রান্তের প্রতিরোধ করে দেশকে বাঁচাবে কে? হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি। পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক বিবি নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, এখানে হবে না কেন? কাণ্ডজ্ঞানহীন নেতৃত্ব রয়েছে বলে? নেতারা নৈবেদ্যর ওপর মণ্ডার মতো। আমরা হচ্ছি নৈবেদ্যের চাল। হিন্দু সমাজ গা ঝাড়া দিলেই এই স্বার্থপর হিন্দু বিরোধী মণ্ডারূপী নেতারা অদৃশ্য হয়ে যাবে। পরিবার পরিকল্পনা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করার এবং হিন্দু কোড বিল তুলে দেবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে চাপ দিন। নেতারা হিন্দুর সেন্টিমেন্টের কোন পরোয়াই করে না। তারা জানে হিন্দুরা অসংগঠিত,

আত্মবিস্মৃত। হিন্দুদের অপমান ক'রে, স্বার্থক্ষুণ্ণ ক'রে বহাল তবিয়তে নেতাগিরি করা যায়। তাই শুধু মুসলমানদের তুষ্ট করে, তোষণ করে, হিন্দু কোড বিল চালু রাখে। গো হত্যার পক্ষে কথা বলে, শাহবানু মামলার রায় পাল্টে দেয়। রামের মন্দির ভেঙ্গে বাবরের তৈরি মসজিদ বিলুপ্ত হলে সবাই বৎসহারা গাভীর মত হয়ে যায়। হিন্দুর উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। রামচন্দ্রকে কাল্পনিক ব'লে উড়িয়ে দিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্র বলে বাবরকে বেশী মর্যাদা দেবার চেষ্টা করে। এরাই বাংলাদেশ থেকে হিন্দু শরণার্থী আত্মরক্ষা করার জন্য ভারতে এলে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেয়, ভারতে থাকতে দেয় না।

বিদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমান হলে একটি কথাও বলে না। বাংলাদেশ থেকে এক কোটি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। একথা বলছে ঢাকার সাংবাদিক এবং বুদ্ধি জীবীরা। মেটিয়াবুরুজ, পার্কসার্কাস, মুর্শিদাবাদে কাতারে কাতারে ঢুকেছে। শুধু কলকাতায় চার লক্ষ বিদেশী মুসলমানদের হিসেব আছে সরকারের খাতায়। ধর্মতলায় ব্যাগ বিক্রেতাদের কিম্বা হাওড়ার সাবওয়ের আশেপাশে তাকালেই এদের দেখা যায়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এদের প্রশ্রয়দাতা। সি. পি. এম. রেশন কার্ড করে দিচ্ছে তো কংগ্রেস ভোটার লিস্টে নাম তুলে দিচ্ছে। শুধু লক্ষ্য সামনের নির্বাচন। কলকাতায় হকার উচ্ছেদ ক'রতে গিয়ে জ্যোতি বসু সব হিন্দু হকারদের তুলে দিলেন। বাংলাদেশ থেকে আসা বিহারী মুসলমানদের তুলতে পারলেন না। তাদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন মিএগা কলিমুদ্দিন। তখন ডেপুটি স্পীকার এখন খাদ্যমন্ত্রী, মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি। প্রত্যেকটি মিটিংয়ে বলেন, আমি আগে মুসলমান, পরে ভারতীয়। এই কথার প্রতিবাদ করতে পারে কোন দলে এমন একজন নেতা নেই।

সুতরাং আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে কাদের হাতে আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ তুলে দিয়েছি। ভাবতে, বুঝতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হ'লে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। ধর্মগুরু, রাজনৈতিক নেতাদের মতো সাহিত্য সাংবাদিকতার জগৎটাও আজ নিয়ন্ত্রণ করছে দিব্যজ্ঞানী ও স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবিরা। দেশের ধর্ম সংস্কৃতি, হিন্দুত্বকে আঘাত করা এদের লক্ষ্য। হিন্দু সমাজের সর্বনাশ করে এরা মানবতাবাদী সাজতে চায়। দেশের ছদ্ম বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিহীন অর্থহীন

প্রবন্ধ লেখে সংবাদপত্রে হিন্দু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিন্দু-সংগঠনের বিরুদ্ধে। আহাম্মকের মতো লেখে হিন্দুরাষ্ট্রের কথা বললে শিখেরা বৌদ্ধরা পৃথক রাষ্ট্র চাইবে। মুসলমানেরা আলাদা রাষ্ট্র চাইবে। এই হতভাগ্যেরা ভারতের সংবিধানটা একবার খুলে দেখে না। যাতে লেখা আছে শিখ বৌদ্ধ জৈন এরা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত। এরা স্মৃতিভ্রংশ অথবা শয়তান। নইলে এদের মনে পড়ত শতকরা ২৩ ভাগ মুসলমান ভারতের ৩০ ভাগ জমি নিয়ে পাকিস্তান তৈরি করেছে। তারপরেও দেড়কোটি হিন্দুকে তাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু জমি দেয়নি।

এদেশের কিম্ভূতকিমাকার রাজনৈতিক নেতারা এবং অপদার্থ বুদ্ধিজীবীরা বড়োই বিচিত্র। এরা হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা দশ লক্ষ প্যালেষ্টাইনী মুসলমান উদ্বাস্তুদের জমি দেবার জন্য সহানুভূতি দেখাতে পারেন। সরকার আর্থিক সাহায্য দিতে পারে। নির্জোট সম্মেলনের নেতা রূপে তাদের জন্য বিশ্বজনমত তৈরি করতে পারে, পারে না শুধু অন্যায়ভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া দেড় কোটি হিন্দুর জন্য ন্যায়ত আইনত প্রাপ্য জমি চাইতে।

বঙ্গসেনা, বি.এল.ও. বাংলাদেশ আটটি জেলা নিয়ে স্বাধীন বঙ্গ-ভূমির দাবী করছে। তার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন করছে। জনমত এই দাবীর পিছনে সংহত হলেও, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হিন্দু এই আন্দোলনে আশার আলো দেখলেও ভারতের সংবাদপত্র নির্বাক। নেতারা, পণ্ডিতেরা বলতে পারছেন না এ দাবী ন্যায্য আইনসংগত এবং মানবিক দাবী। অনেক আগে এই দাবী উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল। রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবীরা এসব ভাবতে পারেন না। রুগ্ন পরাজিত বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা ভাবেন এসব বললে ভারতের মুসলমানেরা আবার যদি রাষ্ট্র চায়। এঁরা ভুলে যান যে, মুসলমানেরা দেশ ভাগ করে নিজেদের রাষ্ট্র বুঝে নিয়েছে। যতটা জমি পাওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী জমি নিয়েছে। অতএব মুসলমানেরা আবার রাষ্ট্র চাইলে তাদের সীমান্ত পার করে দিতে হবে। এটাই হচ্ছে যুক্তি এবং ইতিহাসের শিক্ষা।

কাণ্ডজ্ঞানহীন পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা এ শিক্ষা নেয় না, তারা গোটা দেশকে বিভ্রান্ত করে। আসন্ন সর্বনাশকে আড়াল করতে চায়, হিন্দু বিরোধিতায় উৎসাহ প্রদান করে। কোরান না পড়ে ইসলামকে না জেনে অকারণে তার প্রশংসা করে। কোরানে ঠিক

কি আছে তা নিয়ে কোন বিদগ্ধ লেখক কোনদিন আলোচনা করেন না। কেন করেন না? এঁরা সকলেই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে। 'আনন্দবাজার', আজকাল' অকারণে গরু খাওয়ার পক্ষে ওকালতি করে। বিপক্ষে চিঠি লিখলে ছাপে না। গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে হিন্দুদের ছোট করে দেখানো লেখক বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাশন। প্রগতিশীল হবার তীব্র ইচ্ছা এদের বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিয়েছে। এরা জানে ইসলামে গরু কাটার কোন বাধ্যতা নেই।

কোরানের জন্মভূমিতে গরুই নেই। অথচ এটা গোপালের দেশ। গরুর প্রতি মানুষের প্রচণ্ড শ্রদ্ধা। গরু কাটলে শতকরা পঁচাশিজন মানুষের প্রাণে লাগে। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেয়ে গোহত্যা বন্ধের প্রশ্নকে আমি বেশী জরুরী মনে করি। নেতাজী ঐক্যের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজে গরু খাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ডাক্তার কর্নেল চ্যাটার্জি তাঁর লেখা বইয়ে একথার উল্লেখ করেছেন। সংবিধানে গোহত্যা বন্ধের নির্দেশ আছে। সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চ গোহত্যা নিষেধের পক্ষে রায় দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট গোহত্যা বন্ধের রায় দিয়েছে। বিনোবা ভাবে গোহত্যা বন্ধ করার জন্য অনশন করে নিজের প্রাণটাই দিয়ে দিলেন। তবু গোহত্যা বন্ধ হল না। পবিত্র সংবিধান, মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, অধিকাংশ মানুষের শ্রদ্ধাকেন্দ্র—সবকিছুকেই অপমানিত ক'রে পার পাওয়া যায়, কারণ হিন্দু সমাজ অসংগঠিত।

মুসলমানরা সংগঠিত, তাই তাদের অন্যায় ইচ্ছাকেও সমর্থন ক'রতে হয়। সহস্র যুক্তি থাকলেও এ দেশের কোন লেখক শুয়োর খাবার জন্য কলম ধরতে পারে না। যাত্রায়, নাটকে, সিনেমায় সর্বত্র হিন্দুর শ্রদ্ধাকেন্দ্রগুলোকে লাঞ্ছিত করা হয়। হিন্দু মুসলমানের মিলন দেখাতে হিন্দুর মেয়েকে মুসলমানে নিয়ে যাবেই। সিনেমায় নায়ক-নায়িকা বিপদে পড়লে শুধু আশ্রয় পায় মসজিদে কিংবা গীর্জায়, হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সন্ন্যাসীদের দেখানো হচ্ছে খল চরিত্ররূপে। তাদের কমণ্ডুলে মদ, ঝুলিতে গাঁজা, তারা চোরাচালানদার বদমাইস। আর ফাদার এবং মৌলভীরা স্নেহ ক্ষমার প্রতিমূর্তি! শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সিনেমায় মুসলমান এবং খ্রীষ্টান চরিত্রের মুখে ডায়ালগ থাকে তাদের ধর্মের সপক্ষে। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখানো হয় আল্লার

মহিমা। যীশুর মাহাত্ম্য। যে কোন মুসলীম চরিত্র নাটকের প্রয়োজনে মারা গেলে ভেসে আসবে করুণ আজানের সুর। পর্দায় ফুটে উঠবে মক্কার কাবা। লক্ষ লক্ষ মুসলমান সেখানে নামাজ পড়ছে।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার। জার্মান নাট্যকার ব্রেখটের নাটক বঙ্গানুবাদ ক'রতে গিয়ে তার মধ্যে ক্লাউনের মতো আমদানী করা হচ্ছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে। তাদের মুখে বলানো হচ্ছে শালীনতাবর্জিত ভাষা। সফোক্লিশের নাটক বাংলা করতে গিয়ে, ইবসেনের নাটক চিত্রায়িত করতে গিয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচালক অকারণে আঘাত করেছেন শুধুমাত্র হিন্দু সংস্কারকে। গীতিকার শিল্পীরা কৃষ্ণকে নিয়ে, গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ গান রচনা করছে, গাইছে, রেকর্ড বেরুচ্ছে। বিচিত্র এদেশের হিন্দু ধর্মাচরণকারীরা। এসবে তাদের কোনো কষ্ট হয় না। কোন ভক্তের প্রাণে এ সব লাগে না। ভিখারীর বৈরাগ্য, নপুংসকের ব্রহ্মচর্য, শক্তিহীনের ভক্তি এই রকমই হয়। চ্যাংড়া নাট্যকার, ফক্কড় সাংবাদিকরাও তার পরোয়া করে না।

এদেশের সাংবাদিককুল হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে কোথাও দাঙ্গা হ'লে লেখে, 'দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ', দাঙ্গা যাতে না ছড়ায় এই বৃহত্তর স্বার্থে সত্য গোপন করা হয়। ভাল কথা। কিন্তু হিন্দুদের দুটি সম্প্রদায়ে একটু কিছু হলে বিরাট হেডলাইন আসে 'হরিজনদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের নারকীয় অত্যাচার'—কেন এমন লেখা হয়? কারণ অধিকাংশ সাংবাদিক হিন্দুত্ব বিরোধী দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন। তারা চায় না হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হোক, শক্তিশালী হোক। মালদহের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদে লেখা হ'ল ঘোষেদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা। ঘোষেরা যেন হিন্দু নয়। হিন্দুর সংহতি নষ্টকারী এই সব প্রাণীগুলো আসামের ঘটনা সব জেনেও স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না আসাম আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্রটি কি ছিল। বিভিন্ন ঘটনা, আন্দোলন বহির্ভূত বিষয় নিয়ে সাতকাহন পাঁচালী গেয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন এবারেও সেই আগের মতো বাঙালী বিতাড়ন আন্দোলন। এর আগেও এই সাংবাদিকরা শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন।

বাঙালী বাঙালী ক'রে এরা অস্থির হ'য়ে যান, কিন্তু আসাম থেকে কোনদিন বাঙালী মুসলমান বিতাড়িত হয়নি কেন? বাঙালী মানে কি শুধু 'হিন্দু বাঙালী'? পূর্ব

বাংলার তো সবাই বাঙালী। দফায় দফায় যারা বিতাড়িত হয় তারা শুধু হিন্দু কেন? এই সোজা কথার জবাব এঁদের কাছে নেই। বাঙালীদের জন্য যাদের বেশী দরদ, যারা বাঙালীর স্বার্থরক্ষায় বাঙালীস্তান গড়তে চায় সেই 'আমরা বাঙালী'ও এ প্রশ্নে নীরব। বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের জন্য এরা কোনদিন একটা কথা বলে না। এবারও এঁরা সব সময়ে চেয়েছেন আসামের অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলনকে লঘু ক'রে দেখাতে। এত দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে কখনও হয়নি। সারা দেশের উর্দু পত্রিকাগুলোর আর্তনাদ শুনলেই বোঝা যায় এই আন্দোলনের লক্ষ্য। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের বিতাড়ন। হিন্দুদের বিতাড়ন নয়।

হিন্দু পৃথিবীর যেখান থেকেই আসুক এখানে সে বিদেশী নয়, অনুপ্রবেশকারী নয়, এমন কি শরণার্থীও নয়, এদেশ তার মাতৃভূমি। অসমীয়া হিন্দুরা একথা বুঝেছে, কিন্তু তাদের আরো সক্রিয় হতে হবে। আসামে ঊনপঞ্চাশ লক্ষ বাংলাদেশী মুসলমানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই অনুপ্রবেশ বন্ধ করতেই হবে। না পারলে আসামের রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। আসাম হবে আর একটা পাঞ্জাব কিম্বা কাশ্মীর। আসামের তরুণেরা এ ব্যাপারে সচেতন সতর্ক হচ্ছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে, এটাই আশার কথা। কিন্তু হিতেশ্বর সাইকিয়া, প্রফুল্ল মহান্তির সরকার সবটাই উল্টে দিচ্ছে।

পাঞ্জাব আজ অগ্নিগর্ভ। সেখানে তৈরী হয়েছে শিখ মুসলিম সুহৃৎ সমিতি। এর পিছনে আছে পাকিস্তান এবং এখানকার মুসলমানদের একটি অংশ। হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে শিখেরা কখনোই এতো নিষ্ঠুর নৃশংস হতে পারে না। তিনশো বছরের শিখ ইতিহাসে এরকম নজীরও নেই। নির্মম হিন্দু হত্যায় তাই ফুটে উঠেছে পরিচিত ইসলামিক বর্বরতা। এই বাস্তব অবস্থার ভয়ংকরত্ব এবং সমস্যা সমাধানের কথা কেউ বলতে পারছে না। ঔদার্য নিয়ে, দিব্যজ্ঞান নিয়ে মিথ্যের চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে নিজের মৃত্যু প্রত্যক্ষ ক'রছে হিন্দু সমাজ। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা নিরীহ, উদার পরমতসহিষ্ণু মনুষ্যগোষ্ঠী। যারা শুধু সর্বমানবে নয়, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রতিটি ধূলিকণায় ঈশ্বরকে কল্পনা করেছে। মানবাত্মার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে যাদের ধর্ম-দর্শনে, সেই হিরণ্ময় ঐতিহ্যের ধারক হিন্দু সমাজ আজ বিপন্ন। তথ্য-প্রমাণ-যুক্তির

আলোয় এই কঠিন সত্য নগ্নভাবে প্রকটিত। যত দূর সম্ভব ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত ক'রে হিন্দুত্বকে বাঁচানো আজকের হিন্দুদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।

যে যাই বলুন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের মূল ধারা মানে হিন্দু ধারা। হরিদ্বার থেকে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছাতে গিয়ে গঙ্গায় অনেক নদী এবং নর্দমার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাতে গঙ্গার স্বকীয়তা, পবিত্রতা নষ্ট হয়নি। গঙ্গা গঙ্গাই রয়ে গেছে। হিন্দুও তাই। শক্তির অভাব আমাদের নেই। আছে আত্মিক শক্তি এবং সংখ্যা শক্তি। শুধু নেই আত্মবিশ্বাস এবং সংগঠনশক্তি। ফলে হিন্দু সমাজের অবস্থা অনেকটা উটপাখীর মত। উটপাখী দৌড়তে পারে ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল। লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দিতে পারে একটা তাজা ঘোড়াকে। পায়ে তার এতো জোর। আত্মবিশ্বাস না থাকার ফলে বিপদ দেখলে প্রত্যেকটি উটপাখী কি করে? চোখ দুটো বন্ধ করে ঠোঁটটা বালিতে গুঁজে দেয়। ভাবে বিপদ এড়িয়ে গেলাম। তখন তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ঘেয়ো কুকুর আর রুগ্ন শেয়ালের দল। যারা তার একটা পদাঘাতের যোগ্য নয়। এ অবস্থা চলতে পারে না। সহ্যের অতীত হিন্দু সমাজ সংগঠিত হচ্ছে, জাগ্রত হচ্ছে। হতেই হবে। কারণ লক্ষ লক্ষ বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন, পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ শুভ্র এবং পবিত্র জীবনদর্শনের উজ্জ্বল উত্তরসূরী হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ আমরা কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজনীতিক, বালখিল্য বুদ্ধিজীবী অথবা ভণ্ড ধার্মিকের হাতে ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারি না। কারণ এটা হিন্দু জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন।

যদি না পারি? পঁচিশ বছর পরেই কিছু স্পেসিমেন মনুষ্য আমরা চিড়িয়াখানায় দেখতে পাবো। বাধ্যতামূলক ধর্মান্তরিত অহিন্দু পিতারা তাদের বালক পুত্রদের হাত বলবে ঃ এই দ্যাখ, অতীতে এই দেশে এক ধরণের প্রাণী ছিল এরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর, শক্তিও ছিল যথেষ্ট। এদের নাম ছিল হিন্দু। এদের বেদ ছিল, বেদান্ত ছিল, গীতা উপনিষদ ছিল। মার্ক্সবাদ গান্ধীবাদ ছিল, কিন্তু বাস্তববুদ্ধি ছিল না। তাদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। দিব্যজ্ঞান ছিল শুধু কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তাই তারা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। দু'চারটি প্রাণী মাত্র এখন দেখা যায়, তাই দ্রষ্টব্য বস্তু বলে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছে, মারা গেলে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আরক মাখিয়ে যাদুঘরে রেখে দেওয়া হবে।

❖ দীর্ঘ দিনের কলঙ্ক কালিমা বাবরী মসজিদ হিন্দুরা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। বিশাল হিন্দু সমাজে আত্মবিশ্বাস এসেছে।

❖ দুর্নীতি দূষিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনে স্বস্তি এনে দিয়েছে।

❖ আর্য্যসমাজ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চেষ্টায় এ পর্যন্ত পঞ্চাশ লাখ মুসলমান এবং পাঁচ লাখ খ্রীষ্টান হিন্দু সমাজে ফিরে এসেছে।

❖ মীরাটের ইমাম সৈয়দ মেহেবুর আলী, মাদ্রাজের ইমাম শেখ আমীর মহম্মদের মত শতাধিক পণ্ডিত হিন্দু ধর্মের প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

❖ খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারক এ্যাণ্ডারসন মাউরি হিপসন রায় উত্তর পূর্বাঞ্চলে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির প্রসারে ব্যস্ত রয়েছে।

❖ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল দাউদ ইব্রাহিম, রশিদ খানের এজেন্ট প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় তারা সবাই এক হয়ে হিন্দু সমাজ এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

❖ আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের নগরে বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে হিন্দু সংগঠন এখন ঠিক দাবানলের মতোই ছড়িয়ে যাচ্ছে।

❖ ঘুমন্ত সিংহ হাই তুলছে। আড়মোড়া ভাঙছে। রাষ্ট্রদ্রোহীরা চিন্তিত হয়ে উঠেছে। হিন্দুর জাগরণের আর দেরী নেই।

⌘ ⌘ ⌘

সংযোজন-১

জঙ্গিরা ভারতে এত আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারছে কেন? ইতিহাসের পটে সাম্প্রতিক

পবিত্রকুমার ঘোষ

তিন দশক ধরে ভারতের ভিতরে চলছে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। বক্তৃতার বন্যা বয়ে গিয়েছে, শত্রুকে দমন করার জন্য প্রতিজ্ঞা ও পাঁয়তারা হয়েছে যথেষ্ট। তবু ভারতের কালসর্পযোগ কাটেনি। ইন্দিরা গান্ধী বেঁচে থাকতেই যা শুরু হয়েছিল, তার শেষ দেখা যায়নি। শুধু অসার বাক্যই ভারতের সম্বল।

সর্বশেষ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে ২৫ আগস্ট, হায়দরাবাদে। সন্ধ্যাবেলায় শহরের লুম্বিনী পার্ক ও গোকুল চাটে মানুষের ভিড়ের ভিতর দুটি বিস্ফোরণে মানুষ মরেছিল ৪০ জনের বেশি, আহত অনেক। একই শহরের মক্কা মসজিদে ১৯মে একই ধরনের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছিল ১৬ জন। হায়দরাবাদে শহরে ও তার আনাচে কানাচে জঙ্গিরা কিলবিল করছে বলে গোয়েন্দা পুলিশের ধারণা। তাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতারাই তাদের পৃষ্ঠপোষক।

পুলিশের এই ধারণা, কতটা সত্য, তা ২৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ১৬দিন আগে হায়দরাবাদেই বোঝা গিয়েছিল। সেদিন ওই শহরে তসলিমা নাসরিন গিয়েছিলেন তাঁর একটি বাংলা উপন্যাসের তেলগু অনুবাদ প্রকাশের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল প্রেসক্লাবে।

তসলিমার বক্তৃতা শেষ হতেই রাজনৈতিক পার্টি মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের বিধায়কদের নেতৃত্বে একদল জঙ্গি প্রেস ক্লাবে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে দেয়। আক্রমণ করে, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ঝাঁপিয়ে না পড়লে তসলিমা খুন হতেন। পুলিস এসে জোর করে তসলিমাকে বিমানবন্দরে নিয়ে এসে সোজা কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়।

সেকুলারবাদী কংগ্রেস এখন অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষমতায়। তাদের আচরণই সবচেয়ে অদ্ভুত, প্রায় অবিশ্বাসযোগ্য। তারা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেছে, জঙ্গিদের কিছুই বলেনি। তারপর সংবাদপত্রগুলিতে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস আর রেড্ডি ভালোমানুষের মতো মুখ করে দু-একটি নিন্দাবাক্য খরচ করেছেন।

সেদিনই বোঝা গিয়েছিল, সরকার জঙ্গিদের রক্ষক। লুম্বিনী পার্ক-গোকুল চাটে রক্তবন্যা বওয়ার পর পুলিশ বলেছে, এরকম ভয়ংকর ঘটনা আরও ঘটবে, যখন তখন ঘটবে।

কারণ রাজনীতির খেলা এখনই এমনই যে, জঙ্গিদের হাতে মানুষ বলি হলেও রাজনৈতকি কর্তাদের কিছু এসে যাবে না, জঙ্গিদের তাঁরা খুশ রাখবেনই।

ইন্দিরা গান্ধী এইভাবেই পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী ভিন্দ্রেনওয়ালাকে খুশি রাখতে রাখতে পরিণামে ওই জহিগ নেতার অনুগামীর হাতেই খুন হয়েছিলেন। রাজীব গান্ধী শ্রীলঙ্কার এলটিটিউকে মদত দিয়ে পরে তাদের আত্মঘাতী জঙ্গির ঘটানো বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিলেন।

সরকার বা সরকারের ভিতরের কোনও কোনও চক্র নিজেদের স্বার্থে জঙ্গিদের ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বা তাদরে আনুকূল্য পাওয়ার আশায় দু'মুখো মনোভাব নিয়ে চলেছে। তারা মুখে সেকুলারবাদ আওড়ায়, কিন্তু আড়ালে মৌলবাদী জঙ্গিদের পৃষ্ঠরক্ষা করে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ। বামফ্রন্ট সরকারের মহান কর্তারা ত্রিশ বছর ধরে এই খেলা খেলতে খেলতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে ভারতের মধ্যে মৌলবাদী জহিগদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটিতে পরিণত করেছেন। ভারতে যেখানে যত বিস্ফোরণ জঙ্গিরা ঘটাচ্ছে সেসবের জন্য মানুষ ও মাল পশ্চিমবঙ্গ থেকেই যায়। একথা দিল্লির গোয়েন্দারা জানে ও জানিয়ে দেয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের গোয়েন্দারা চোখে ঠুলি, কানে তুলো গুঁজে থাকে।

তারও কারণ, সরকারের কর্তারা সেরকমটাই চান। এ বিষয়ে জ্যোতি বসুর রেকর্ডই ছিল সর্বোত্তম। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতেন, বাংলাদেশ থেকে কোনওরকম অনুপ্রবেশই বন্ধ করা যাবে না, কারণ সীমান্তের দু'দিকের মানুষের চেহারা এক, পোশাক এক, ভাষা এক, কালচারও এক। তিনি নিশ্চিত কণ্ঠে একথাও বলতেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনও জঙ্গি নেই, পাকিস্তানের আই এস আইয়ের কোনও চক্র নেই, মৌলবাদী চক্রান্ত নেই।

কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম করা হয়ে থাকে। বিশেষত, সিপিএমের শাসনকালে। সরকারের বড়কর্তা যা ইচ্ছা করেন, প্রশাসন ও পুলিশ সেভাবেই চলে। ওই দুই বস্তুর ওপর সিপিএমের ছোট কর্তাদেরও অপ্রতিহত প্রভাব। এই ছোট কর্তারা নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। 'দেশ' বলে তাঁদের কাছে কিছু নেই, টাকা ও ভোটই তাঁদের একমাত্র বিবেচ্য। অনুপ্রবেশকারীদের বৈধ নাগরিকের স্বীকৃতি দিতে তাঁদের আগ্রহ অপরিসীম। সেই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে যদি জঙ্গিরা লুকিয়ে থাকে, তাহলেও।

জ্যোতি বসুর আমলে বড় পুলিশ কর্তারা অনায়াসে বলে দিতেন, এ রাজ্যে কোনও জঙ্গি সমস্যা নেই। দিল্লী থেকে গোয়েন্দাসূত্রে সতর্ক করে দেওয়া হলেও এখানকার মহাপ্রভুরা গা

করতেন না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কিছুটা নড়েচড়ে বসতে চেয়েছিলেন হয়তো, কিন্তু তাঁর পার্টির আশু লাভ যেখানে জড়িত, সেখানে তাঁর হাত চলে না।

ফরওয়ার্ড ব্লক আবার সিপিএমের চেয়েও বড় সেকুলার। তাদের নেতাদের একটা প্রধান কাজ হল, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে উঠতে-বসতে গালমন্দ করা। এই বাহিনী অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া হলেই ফরওয়ার্ড ব্লক চেঁচায়, সীমান্তরক্ষী বাহিনী সীমান্ত এলাকার লোকদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। একবার দিল্লী থেকে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের একটি দলকে ট্রেনে করে পশ্চিমবঙ্গের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল, সীমান্ত পার করিয়ে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে। খড়্গপুরের কাছে ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীরা তাদের নামিয়ে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিল। কলকাতার এই ইমাম তসলিমা নাসরিনের মুণ্ডু দাবি করার পর ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ভক্তিপদ ঘোষ লখনউয়ে নয়টি মুসলিম সংগঠনের নেতাদের বলেছেন, তাঁর পার্টি কেন্দ্রকে বলবে তসলিমা নাসরিনকে বাংলাদেশে বিদায় করে দিতে। কারণ এই ভদ্রমহিলা ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে মৌলবাদী মুসলিমদের কৃত হিন্দু নিধন যজ্ঞের বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'লজ্জা' উপন্যাসে। ওই বই মুসলমান ভাইদের বড়ই লজ্জার কারণ হয়ে আছে। সেজন্য সেকুলার ভারতে তাঁকে থাকতে দেওয়া চলবে না; যদিও সবাই জানে, তসলিমাকে ধরে-বেঁধে বাংলাদেশে ফেরত পাঠালে তাঁকে হায়নাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ছোট ও বড় রাজনৈতিক দলগুলির এবং তাদের সরকারের রক্ষাকবচ পেয়ে জঙ্গিরা ভারতকে রক্তে স্নান করিয়েই চলেছে। ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত জঙ্গিদের হাতে নিহত হয়েছে ৩ হাজার ৬৭৪ জন নির্দোষ নাগরিক। কিন্তু জঙ্গিদের হাতে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন মোট ৫৫ হাজার জন ভারতীয়। ভারত-চীন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে এর ভগ্নাংশমাত্র মানুষ মরেছিল। জঙ্গিদের আক্রমণে মানুষ মরলে সরকার শুধু দুঃখপ্রকাশ করে, মন্ত্রীরা 'দেখে নেব' ভাব দেখান। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পুলিশ ঘটনা ঘটার পর কতগুলি লোককে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু প্রমাণ জোগাড় করতে পারে না বলে আদালত তাদের ছেড়ে দেয়। সরকার যেসব আইন করেছে তাতে ফাঁকফোকর রেখেই তা করেছে। পোটা আইন তারা তুলেই দিল। পুলিশের দাবি, উপযুক্ত আইনের অভাবে তারা জানা জঙ্গিদেরও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

হায়দরাবাদে পুলিশ বলেছে, কমপক্ষে এক হাজার জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি ওই শহরে রয়েছে। তাদের সাহায্যকারী গুপ্ত সেলও অনেক আছে। তাদের পাকড়াও করলেই

পুলিশের কাছে উঁচু মহল থেকে ফোন আসে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। একজন মৌলবাদীকেও গ্রেপ্তার করলে নাকি ভোটবাক্সে ধস নামবে। পুলিশের মতে, মৌলবাদীদের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের মধ্যে যাদের গায়ে যত বেশি, দাগ, তাদরে কাছ থেকে তত বেশি লাভ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তাদের ব্যবহারমূল্য তত বেশি। বিনিময়ে তাদেরও স্বাধীন অপারেশন চালাতে দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে এটাই নাকি শান্তি বজায় রাখার সরকারি ফরমূলা। এই রাজ্যকে জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় করে দেওয়া হয়েছে বলেই জঙ্গিরা নাকি এখানে শান্তি বজায় রাখে। সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গিদের নিরাপদতম স্থান। তাই অন্যান্য রাজ্যের মতো বিস্ফোরণ এখানে তারা ঘটায় না। এখানে তারা নাকি স্থানীয় রাজনৈতিক কমরেডদের মাসতুতো ভাই। এই একটি ব্যাপারেই এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির মত অভিন্ন, পথও এক। তাদরে সকলের সহযোগিতায় এ রাজ্যে 'মৌলবাদী জঙ্গি পালন প্রকল্প' হেসে খেলে চলছে। কোনও জেলা প্রশাসক বা পুলিশ অফিসার যদি এই প্রকল্পে খোঁচা দিতে যান, তাহলে তাঁর বদলি হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

হায়দরাবাদে বিস্ফোরণের আগেই ওইরকম ঘটনা ঘটতে পারে বলে দিল্লির গোয়েন্দারা অন্ধপ্রদেশের পুলিশকে জানিয়েছিল। সেই সতর্কবাতা পেয়ে অন্ধ্রের পুলিশ পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন হরকত-উল-জেহাদি (হুজি) এবং কুখ্যাত লস্কর-ই-তেইবার ঘাঁটিও এজেন্টদের খুঁজতেই তারা এখানে এসেছিল। অন্ধ্রের পুলিশ খবর পেয়েছে, হায়দরাবাদ, বিজেয়ওয়াড়াসহ তাদের রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় বড়সড় হাঙ্গামার ছক পশ্চিমবঙ্গে বসেই তৈরি করেছে হুজি ও তোইবার জঙ্গিরা।

অন্ধ্রের পুলিশ টিম কলকাতার বড়বাজার মেছুয়াবাজার, বনগাঁ, বাগদা, বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ ছাড়াও আরও কয়েকটি জায়গায় হানা দিয়েছিল। তারা এ রাজ্যের গোয়েন্দাদের জানিয়ে গিয়েছে, এ রাজ্য থেকে কিছু মুসলিম যুবক এবং বাংলাদেশি জঙ্গি অন্ধ্রে গিয়ে সেখানকার 'দারুল-উলুম-আল-মাহর্দি-উলআলিয়ান-ইসলামি' নামক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জেহাদি প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এর মধ্যে ২২ আগস্ট দুজন বাংলাদেশি যুবক বনগাঁ দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যায়। তারা হুজির লোক। হায়দরাবাদ পুলিশ মনে করে, ২৫ আগস্ট হায়দরাবাদ বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা হুজির মহম্মদ শাহিদ ওরফে বিলাল। সে পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আইএসআই তাকে বাংলাদেশে হুজির কর্তা করে দিয়েছে।

ভারতে বিলালের প্রথম অপারেশন হয়েছিল ২০০৫ সালে ১২ অক্টোবর, দশহরার দিন। সেদিন সে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল হায়দরাবাদের পুলিশ কমিশনারের অফিসেই। তার পরবর্তী অপারেশনগুলির মধ্যে আছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেকার সমঝোতা এক্সপ্রেস, হায়দরাবাদেই মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ ইত্যাদি। যে দুজন যুবক বনগাঁ সীমান্তে ধরা পড়েছে, তারা এক বছর ধরে হায়দরাবাদের উপরোক্ত দারুল-উলুমে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

কলকাতার চার যুবক, আমির রেজা খান, খুর্‌রম খৈয়াম, নিয়াজ হুসেন এবং সাদাকত হুসেনের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারি করেছে, ইন্টারপোল। কোনও জঙ্গি পাকিস্তানে আশ্রয় পেলে ইন্টারপোলের তোয়াক্কা রাখার দরকার তার পড়ে না। আমির রেজা ছিল কলকাতার বেনিয়াপুকুরের বাসিন্দা। সে এখন পাকিস্তানে হুজির প্রধান।

ঠ্যালায় পড়ে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এখন বেশ কিছু মাদ্রাসার ওপর নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের কাছে রিপোর্ট আছে এই রাজ্যের ১৯টি জেলায় ২৪৭৭টি স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা আছে সীমান্ত ঘেঁষে বাংলাদেশের জমিতে মাদ্রাসার মালা সাজানো হয়েছে। এইসব মাদ্রাসার টাকার অভাব নেই। তারা বিনা পয়সায় ছাত্র পড়ায়, বইপত্র দেয়, আবাস ও খাদ্য জোগায়। পশ্চিমবঙ্গের অবৈধ মাদ্রাসাগুলির সঙ্গে স্থানীয় মাতব্বররা জড়িত। এইসব মাদ্রাসা জঙ্গি উৎপাদনের কারখানা বলে ব্যাপক ধারণা আছে। এতকাল পরে সেগুলির ওপর পুলিস নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছে। তবে মাতব্বররা পুলিশের প্ল্যান ভেস্তে দিতে চাইবেনই।

রাজ্যের গোয়েন্দাদের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকাগুলিতে হুজি বড় ধরনের জাল বিস্তার করে ফেলেছে। আইএসআইয়ের পুরানো নেটওয়ার্ক তারা কাজে লাগাচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর মনে করছে, হায়দরাবাদের বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগ আছে। অন্য কয়েকটি রাজ্যের পুলিশ অভিযোগ জানিয়েছে, বাংলাদেশি জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গকে 'মরূদ্যান' রূপে বেছে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তরের অফিসারদের মতে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে এ রাজ্যে জঙ্গিদের পাকড়াও করতে পুলিশ অভিযান হয় না। রাজ্য পুলিশের ডিজি অনুপভূষণ ভোরা উলটো কথা শুনিয়েছেন। তবে উলটো কথা তাঁকে বলতেই হবে। এ রাজ্যের কোনও পুলিশ অফিসারেরই সত্য বলার সাহস নেই। সেজন্যই রাজ্যের পুলিশকর্তারা ভুলেও স্বীকার করেননি, ভিন্ন রাজ্যের উর্দুভাষী ইমামরা এখানকার সীমান্তবর্তী বহু খারিজ মাদ্রাসা ও মক্তবে গেড়ে বসেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর বামফ্রন্ট সরকারকে জানিয়েছে, ওই মাদ্রাসা ও মক্তবগুলি থেকেই জঙ্গি প্রশিক্ষণ

দেওয়া হচ্ছে ও জেহাদি উৎপাদন করা হচ্ছে। ওই মাদ্রাসা ও মক্তবগুলি থেকেই জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ও জেহাদি উৎপাদন করা হচ্ছে। ওই মাদ্রাসা ও মক্তবগুলির এটাই প্রধান কাজ। ওই খারিজি মাদ্রাসাগুলির জন্য ট্রাস্ট বা হাওলার মাধ্যমে পেট্র-ডলার আসে। বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিরা এসে এইসব মাদ্রাসায় আশ্রয় নিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর বামফ্রন্ট সরকারকে আরও বলেছে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তঘেঁষা আটটি জেলায় প্রতি মাসে একটি করে ইসলাম শিক্ষণ আসর গজিয়ে উঠছে। বেশ কিছু মাদ্রাসা হঠাৎ বিশাল বিশাল বাড়ি বানাচ্ছে। সরকার এসব দেখেও দেখে না। মাদ্রাসাতে থেকেই শত শত মুসলিম যুবক জঙ্গি ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা নেয়। মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ে পাকিস্তানের মানচিত্র ছেপে তার নীচে লেখা হচ্ছে; ''চিনে নাও, এই তোমাদের দেশ।'' এইসব মাদ্রাসার ওপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

যদি সরকার এইসব মাদ্রাসা ও মক্তবের ওপর বিন্দুমাত্র নজর দিতে যায়, তাহলে বড় বড় রাজনৈতিক পাণ্ডা রে রে করে তেড়ে আসবেন। এবিষয়ে সিপিএম., কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস একই পন্থী। কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলিম জঙ্গিবাদকে কীভাবে উসকানি দিচ্ছে তার প্রতি সাম্প্রতিক একটি নজির দিচ্ছি।

গত রবিবার, ২ সেপ্টেম্বর বর্ধমান জেলার সংখ্যালঘু সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান এসএমএস হায়দার জিজ্ঞাসা করেছেন, বামফ্রন্ট সরকার তসলিমা নাসরিনকে আশ্রয় দিয়েছে কেন? ওই ইসলাম অপমানকারিণী মহিলাকে এখনও এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত দেওয়া হোক। সরকার যদি তা না করে, তাহলে রাজ্যের তিন কোটি মুসলমান মহাকরণ ঘেরাও করবে। সোনিয়া গান্ধী নিজে জনাব হায়দারকে কংগ্রেসের নেতা করে এ রাজ্যে পাঠিয়েছেন।

বর্ধমান জেলার পারাজ-পুরুষা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাঘরে ওই সম্মেলন হয়েছিল। ওই সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান এবং নুরুল ইসলাম হায়দারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই কথা বলেছে। হায়দরাবাদের মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের নেতাদের সঙ্গে এ রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের পার্থক্য কোথায়? ইমাম বরকতির সঙ্গেই বা তাঁদের তফাত কোথায়? তাঁরাও তো তসলিমা নাসরিনকে খুন করতে চেয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, মজলিস উত্তেহাদুল মুসলিমিন সন্ত্রাসবাদীদের রক্ষা করে, পুলিশের হাত থেকে তাদের বাঁচায়। তাদের সঙ্গে এ রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা সুর মেলান কেন?

সৌজন্যে ঃ দৈনিক বর্তমান (০৬-০৯-০৭)

সংযোজন-২

নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িকতা

সরকারের পুলিশ ও সিপিএমের হার্মাদবাহিনীর দানবীয় সন্ত্রাসের পর 'ব্যাকফুটে চলে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রী এবার মুসলিম তাস খেলে নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মুসলমানদের মন জয় করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি মাঠে নামিয়েছেন দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারিকে। তিনি নাকি শান্তির বার্তা নিয়ে নন্দীগ্রামে গিয়েছেন। এই ঘটনাকে নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কী-ই বলা যায়? নিজেদের হঠকারিতার জন্য বুদ্ধদেববাবুরা পশ্চিমবঙ্গের যে সর্বনাশ করেছেন, তা সংশোধনের চেষ্টা না করে তাঁরা এখন পির-ফকির-দরবেশ, তাবিজ-মাদুলির টোটকা খুঁজছেন। সিপিএম-পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারে এত অধঃপতন প্রকাশ্যে এর আগে দেখা গিয়েছে কি?

দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম বুখারি সোমবার মহাকরণে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ একান্তে আলোচনা করেছেন। আলোচনার শেষে সাংবাদিকদের বুখারি বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে জানলাম। ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের পুলিশি গুলিচালনার ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রী দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, নন্দীগ্রামে আর জমি নেওয়া হবে না। ওখানে কেমিকেল হাবও হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে, নন্দীগ্রামে শান্তি ফেরা উচিত। আমি সেখানে গিয়ে শান্তির আবেদন জানাব।"

ইমাম বুখারির এই উদ্যোগে যে বুদ্ধদেববাবুর উদ্যোগ এবং সম্মতিতে হয়েছে, সেকথা মঙ্গলবার সিপিএমের মুখপত্র 'গণশক্তি'তেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার কথা বুখারি বলেন, মঙ্গলবার সকালে তিনি নন্দীগ্রাম যাবেন। এব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীও সম্মতি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলেছেন যে, নন্দীগ্রামে শিল্পের জন্য কোনো জমি অধিগ্রহণ হবে না। নন্দীগ্রামের যে সমস্ত মানুষ এখনও বাইরে রয়েছেন, তাঁদের ফিরে আসতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুখারী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন সেখানকার মানুষকে আমি জানাবো।"

'গণশক্তি'র এই রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রীর কথামতো, তাঁর আবেদন ও নির্দেশমতোই ইমাম বুখারি নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? তিনি কি কমিউনিস্ট

পার্টির লোক? তিনি কি সিপিএম দলের লোক? তিনি কি এ রাজ্যের লোক? নন্দীগ্রামের পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর কি কোনও সম্পর্ক আছে? এ ব্যাপারে তাঁর কি কোনও রকম ধারণা আছে? অশান্তির আগুন নেভাবার কাজে দেশে-বিদেশে ইমাম বুখারির কোনও খ্যাতি আছে?

দিল্লির জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি এইসব কোনও গুণ আছে বলে কেউ জানেন না, কেউ কোনও দিন শোনেনওনি।

তাহলে বুদ্ধদেববাবু হাতে-পায়ে ধরে 'আবেদন' করে বুখারিকে নন্দীগ্রামে পাঠাচ্ছেন কেন?

কারণ ইমাম বুখারি মুসলমান এবং তিনি একজন মুসলিম নেতা। বুদ্ধদেববাবুর পুলিশ ও সিপিএমের হার্মাদবাহিনী নন্দীগ্রামে হিন্দুদের মতো বেশ কয়েকজন মুসলমানকেও হতাহত করেছে। জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের ঘরবাড়ি। বহু হিন্দু চাষির মতো সেখানে বহু মুসলমান চাষিও পাশবিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন। নন্দীগ্রামে যদি শুধু হিন্দুরা মরতেন, অত্যাচরিত হতেন, তাহলে বোধহয় বুদ্ধদেববাবুর এত 'ভুল স্বীকার' এত শান্তির উদ্যোগ দরকারই হত না। সেজন্যই কি সিঙ্গুরে পুলিশ ও ক্যাডারবাহিনীর অত্যাচার, খুন-জখম নিয়ে বুদ্ধদেববাবুরা সেই ক্ষতে মলম লাগাতে ইমাম বুখারিকে 'শান্তির দূত' করে পাঠালেন না?

আজ কোনও বিজেপি-শাসিত রাজ্যে অনুরূপ ঘটনায় রাজ্য সরকারে কর্তারা যদি শঙ্করাচার্যকে শান্তির দূত হিসেবে ব্যবহার করতেন, তাহলে বুদ্ধদেববাবুরা কি শতমুখে তার নিন্দা করতেন না? সিপিএমের পেটোয়া বুদ্ধিজীবীরা কি তাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে গলা ফাটাতেন না?

নন্দীগ্রামের মুসলমানদের দলে টানার জন্য ইমাম বুখারিকে সেখান পাঠিয়ে বুদ্ধদেববাবুরা যা করলেন, তাকে এক কথায় নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িকতা বলাই সঙ্গত।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক বর্তমান (১৩-০৬-০৭)

কে এই শিবপ্রসাদ রায় ?

৭০-এর দশক এই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল 'মুক্তির দশক' স্লোগান কাঁধে নিয়ে। সারা বাংলা লাল হয়েছিল মানুষ খুনের রক্তে। আর ৭০-এর দশক যখন শেষ হল তখন দেখা গেল রক্তমাখা বামশাসন চেপে বসেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। যে লাল আফিম্ বাঙালি হিন্দুকে সেবন করানো শুরু হয়েছিল বিগত শতাব্দীর ২০-র দশক থেকে, সেই আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে বাঙালি হিন্দু নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধ ও পিতৃপিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে বিপন্ন করে তুলেছিল নিজের অস্তিত্বকে। নেশার ঘোরে সে ভাবতে লেগেছিল নিজের পায়ের নীচের মাটির থেকেও প্রগতিশীলতা বড়, মা-বোনের সম্ভ্রমের থেকেও ধর্মনিরপেক্ষতা বেশী দামী, বিবেকানন্দ-নেতাজী-ক্ষুদিরাম থেকে লেনিন-স্ট্যালিন-মাও বেশী প্রাসঙ্গিক, নিজের মা-বাবার চেয়েও পার্টির নেতারা বেশী আপন। ঠিক সেই সময় **'দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই'** নামক একটি সাজসজ্জাহীন চটি বই যেন বাঙালী হিন্দুর নেশাগ্রস্ত চেতনায় চাবুক হানল। সে প্রথমে চমকে উঠল। তারপর দুহাতে চোখ ঘসে উঠে বসল। ভাবতে লাগল, তাই তো একথা তো আগে মনে হয়নি। এই বইয়ের কথাগুলো যে মর্মান্তিক সত্য কথা! এ যে বাঙালি হিন্দুর জীবন-মরণের প্রশ্ন! তার চেতনা ফিরে এল।

'দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই' বইটির লক্ষ কপি সারা বাংলা ছেয়ে গেল। রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গেল আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং যেখানেই বাংলাভাষীরা থাকে। তারপর অনুবাদ হল ভারতের প্রায় সবকটি ভাষায়। তারপর ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা পাড়ি দিল চটি বইটি। ইতিমধ্যে ঐ অখ্যাত লেখক শিবপ্রসাদ রায়ের হাত থেকে বেরোতে লাগল একের পর এক বই—সময়ের আহ্বান, আমরা ও তোমরা, আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও, রহস্যময় আর এস এস, আমি স্বামীজী বলছি, চতুর্বর্গ, অনুপ্রবেশ, ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালি হিন্দু জাগ্রত হল, তারপর উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দুত্ব আন্দোলনে। শহরে, গ্রামে, হাটে-বাজারে খুঁজতে লাগল কোথায় আছে হিন্দু সংগঠন? কেউ খুঁজে বের করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে, কেউ পৌঁছে গেল বিশ্ব হিন্দু

পরিষদের কার্যালয়ে, কেউ বা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজেপি-র কাজে। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বইতে লাগল হিন্দুত্বের প্রবল জোয়ার। সেই গৈরিক জোয়ারের আঘাতে ফিকে হয়ে গেল বাঙালি হিন্দুর আফিমের লাল নেশা। 'এই বাংলা থেকে একটা ইটও অযোধ্যায় যেতে দেব না'—এই দম্ভোক্তি, রক্তচক্ষু ও লাল শাসানিকে অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার 'রামশিলা' বাংলার হাজার হাজার গ্রামে-শহরে সাড়ম্বরে পূজিত হয়ে রওনা দিল শ্রীরামের জন্মস্থান অযোধ্যার পথে, এই রাজ্যেরই পুলিশ প্রশাসনের এসকর্টে।

মানুষ খুঁজতে লাগল কে এই অজানা-অনামা লেখক শিবপ্রসাদ রায়? কোথায় থাকেন? জানা গেল এই শিবপ্রসাদ রায় থাকেন বর্ধমান জেলার কালনা শহরে। অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, কিশোর বয়স থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক। অনেকদিন সংঘের প্রচারক ছিলেন। পরে ছিলেন জনসংঘের কর্মী। জরুরী অবস্থায় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথাগত শিক্ষা প্রায় কিছুই ছিল না। ছিল শুধু হিন্দুত্ব আদর্শের তীব্র প্রেরণা ও ব্যক্তিজীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা। এইটুকু সম্বল করেই এই লাল বাংলায় তিনি বাজিয়েছিলেন হিন্দুত্বের পাঞ্চজন্য শঙ্খ। হিন্দু বাংলার মর্মস্থলে তিনি নাড়া দিয়েছিলেন।

পরিচিতি হওয়ার পর তাঁর ডাক পড়েছিল সর্বত্র। পশ্চিমবঙ্গে ও বাইরে। সব জায়গায় গিয়ে তাঁর যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ অনর্গল ভাষণের মাধ্যমে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন হাজার হাজার শ্রোতাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একাধারে লেখক ও বাগ্মী।

আমাদের সকলের আপন শিবুদা আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। অকৃতদার শিবুদা নিজ পরিবারের জন্য (বিধবা মা এখনও জীবিত) রেখে যাননি এক কপর্দকও। শুধু রেখে গেছেন তাঁর অজস্র বই, লেখা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত ভক্তকে। তারাই বহন **করবে শিবুদার জীবনব্রত—হিন্দুত্ব আন্দোলনের গৈরিক পতাকাকে।**

কলকাতা **তপন কুমার ঘোষ**

৬ই জুলাই, ২০০১

প্রকাশকের কথা

এই ছোট্ট বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। তারপর বহু সংস্করণ হয়েছে। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছে। এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। এক নতুন প্রজন্ম দিশা পেয়েছে। এই বই পড়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সংগঠনগুলিতে অনেক মানুষ যোগ দিয়েছে। বইটির এই গ্রহণীয়তা ও উপযোগিতা দেখে লেখক শিবপ্রসাদ রায় পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সেই সংযোজন করেছিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মনে রেখে। সেই সংযোজনেই ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের নাম যুক্ত হয়েছিল। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। লেখক গত হয়েছেন। এই বইয়ে তার কিছু কিছু কথা আজ পাঠকের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করতে পারে। যেমন কোন রাজনৈতিক দল বা কোন সংগঠনের বর্তমান ভূমিকার কথা। মনে রাখতে হবে লেখক এই পরিস্থিতি দেখে যান নি। তাই এই অসামঞ্জস্য। এই বইয়ে লেখক যে আশা প্রকাশ করেছেন, তা কোথাও কোথাও হয়ত বাস্তবে রূপ নেয়নি। হিন্দু নেতৃত্বের অনেকে নিজেদেরকে ও নিজেদের দলকে সেক্যুলার প্রমাণিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেও। আবার একবার বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে হিন্দু সমাজ। কিন্তু লেখকের এই বই হিন্দু সমাজকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সঠিক নেতৃত্ব খুঁজে নিতে সাহায্য করবে এই আশা নিয়ে এই বইয়ের পুনঃপ্রকাশ। সঠিক নেতৃত্ব খুঁজে নেওয়ায় ব্যর্থতার কারণেই দেশ ভাগ, বাংলা ভাগ, কোটি কোটি রিফিউজি, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমনাশ। আবার এই ব্যর্থতা, ভুল, এই খণ্ডিত ব্যক্তি এই কঠোর সত্য সর্বদা অনুভব করেছেন। তাই আবার একবার হিন্দু বাংলাকে জাগানোর উদ্দেশ্যে এই বই আবার ছাপানো।
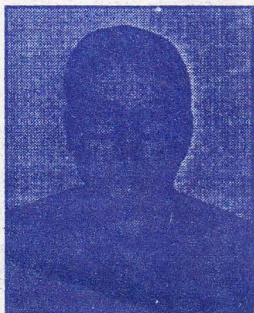
শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা